জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং— ২৬, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ ইং, মঙ্গলবার

JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbatthya Chattagram Janasamhati Samiti

Issue No.—**26, 6th year, 10th September 1996, Tuesday.**

সম্পাদকীয়

বিগত জুন মাসে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২১ বৎসর পর বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে আওয়ামীলগের এটা হচ্ছে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বছর মেয়াদী আওয়ামীলীগ সরকারের শাসনামলের সকল ভুলভ্রান্তির ক্ষমা প্রার্থনা করলেও একটা পরিবর্তনের আশায় দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রকামী জনগণের ন্যায় জুম্ম জনগণও আওয়ামীলীগের প্রার্থীদের এবারে জয়যুক্ত করেছে। এটা সত্য যে, আওয়ামীলীগই হচ্ছে দেশের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল, যে দল ১৯৭১ সালে তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। সেই সময়ে আওয়ামীলীগ ছাড়া দেশের বর্তমান অন্যান্য বৃহৎ দলগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সেই সময়ের সদ্য স্বাধীন দেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকারের বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি সহ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফলে ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ সালে এক বীভৎস ও রক্তাক্ত অভ্যুত্থান এর মাধ্যমে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে বর্তমানের অন্যান্য বৃহৎ বিরোধী দলগুলির আবির্ভাব ঘটে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকারের কাছে দেশের জনগণের গভীর প্রত্যাশা রয়েছে। বিশেষ করে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অক্ষুন্ন রেখে দেশের শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নই জনগণের একান্ত প্রত্যাশা। বলাবাহুল্য, বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারও জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই প্রেক্ষিতে দেশের আপামর জনগণের ধারণা এবারের আওয়ামীলীগ সরকার অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়ে দেশে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে এগিয়ে আসবেন।

বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের কাছে জুম্ম জনগণও এক নিবিড় প্রত্যাশার দাবীদার। বিগত ৫ম জাতীয় সংসদ ও এবারের সংসদে জুম্ম জনগণ বরাবর তিনটি পার্বত্য জেলার সংসদীয় আসনে আওয়ামীলীগকে জয়যুক্ত করে এসেছে। এসব নির্বাচনে জুম্ম জনগণ আওয়ামীলীগের উপর গভীর আস্থা জ্ঞাপনের প্রধান কারণ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে আওয়ামীলীগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার। আওয়ামীলীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে যেমনি দলীয় নীতি ঘোষণা করে আসছে তেমনি বারে বারে সমস্যা সমাধানেরও অঙ্গীকার করে আসছে। শেখ হাসিনা সহ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে আসছে। ১৯৯২ সালে লোগাং গণহত্যার স্থান পরিদর্শন করে আওয়ামীলীগ নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম জনগণের মাঝে দাঁড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য তৎকালীন বি এন পি সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছিলেন। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রতি আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের এসব বক্তব্য, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিই আওয়ামীলীগের প্রতি জুম্ম জনগণকে আস্থাশীল করে তোলে। তাই আজ জুম্ম জনগণ সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর অধিক বৎসরের সকল প্রকার অত্যাচার, নিপীড়ন, বঞ্চনা, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ থেকে মুক্তি, ভূমির অধিকার সংরক্ষণ, গণতান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী ও সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধান বর্তমান সরকার তথা জাতীয় সংসদের নিকট প্রত্যাশী।

সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একমাত্র সমাধান

শ্রীজগদীশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বাংলাদেশের যে অন্যতম একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা এবিষয়ে আজ আর কারোর দ্বিমত নেই। বিশেষ করে বিগত এক দশকে (১৯৮৫-১৯৯৫) এই সমস্যা যেমন জটিল আকার ধারণ করেছে তেমনি দেশে বিদেশেও এর ব্যাপকতা সম্প্রসারিত হয়েছে। যার ফলে বিগত বাংলাদেশ সরকারগুলোকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু না কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়। তাই ১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম তৎকালীন জাতীয় পার্টি সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক (২১শে সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সরকার পক্ষ সর্বপ্রথম এই সমস্যাকে বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকার করে। এরপর ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে আবার সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে পর পর পাঁচটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সাথে ছয়টি বৈঠক করেও তৎকালীন সরকার এর সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান না করে শেষ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতিকে পাশ কাটিয়ে তিন পার্বত্য স্থানীয় জেলা পরিষদ সৃষ্টির মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের একপক্ষীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এরপর ১৯৯১ সালে বি এন পি সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯২-১৯৯৫ এর মধ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে আবার তের বার বৈঠকে বসে। কিন্তু বি এন পি সরকারের অসহযোগিতা ও অসদিচ্ছার কারণে এইসব বৈঠক সমূহে এই সমস্যা সমাধানে কোন অগ্রগতি সাধিত হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যায়। তদুপরি সরকার পক্ষের প্রহসনমূলক সংলাপের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা আরো জটিলতর রূপ লাভ করতে থাকে।

এইটা অত্যন্ত বাস্তব যে কোন সমস্যার মূলে কতগুলি মৌলিক কারণ নিহিত থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূলেও রয়েছে অনুরূপ কতগুলি মৌলিক কারণ। এসব মৌলিক কারণগুলির মধ্যে রয়েছে দশ ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি পাওয়ার সমস্যা, গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা, ভূমির অধিকার রক্ষার সমস্যা, স্বকীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের সমস্যা এবং স্বীয় ধর্মবিশ্বাস, প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখার সমস্যা। এক কথায় বলা যায় ভারত বিভক্তির পর থেকে পাকিস্তান সরকারের সংবিধানিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শোষণ ও বঞ্চনা এবং জুম্ম বিদ্বেষী নীতির প্রেক্ষিতে এসব সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে অধিকতর জটিলতর রূপ লাভ করতে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এসব সমস্যা আবার নূতন মাত্রা রূপ লাভ করে। শুরু হয় জুম্ম জনগণের উপর রাজনৈতিক নির্যাতন, অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, গণহত্যা। তদুপরি জুম্ম উচ্ছেদ ও অস্তিত্ব ধ্বংসের লক্ষ্যে শুরু হয় সরকারী উদ্যোগে ব্যাপক অনুপ্রবেশ। এতে বহিরাগতরা জুম্মদের ভূমি ও বাগ-বাগিচা বেদখল করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উচ্ছেদ করতে থাকে। ১৯৮৬ সালের সরকারের ব্যাপক জুম্ম উচ্ছেদ অভিযান ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বর্তমানেও ৫০ হাজারের অধিক জুম্ম ভারতের ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষতঃ সরকারী ও বেসরকারীভাবে ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে জুম্মরা আজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে চলেছে। এইসব মৌলিক সমস্যার কারণে জুম্ম জনগণ জাতীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব বিগত ২৫ বৎসর ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বিগত দুই দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত। সময়ান্তরে শান্তিবাহিনী ও সরকারী বাহিনীর বন্দুকের নল থেকে উদ্‌গিরণ হয় বারুদের

আগুন। ছাই হয়ে যায় জুম্ম অধ্যুষিত গ্রাম ও লোকালয়, বন-বাদার হয় রক্তাক্ত। রাজপথও হয়ে যায় প্রতিবাদী জুম্ম সমাজের রক্তে রঞ্জিত। সরকারী বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে বহিরাগত হায়েনারা জুম্মদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও সংঘটিত করে কমলপতি, ভূষণছড়া, পানছড়ি, লংগদু, লোগাং, নান্যাচরের মত তেরটি গণহত্যা। দেশের দুই শৈল শহর রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের জুম্ম অধ্যুষিত এলাকাও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে উগ্র ধর্মান্ধদের সাম্প্রদায়িক আগুনে। জুম্ম যুবতীরা বারে বারে হচ্ছে নরপশুদের হাতে ধর্ষিতা ও অপহৃতা। অতি সাম্প্রতিক কালের বাঘাইছড়ি থানার প্রত্যন্ত গ্রাম নিউ ল্যাল্যাঘোনার (উগলচড়ি) কল্পনা চাকমাও হয়েছে নরদানব কজোইছড়ি ক্যাম্পের কমাণ্ডার লেঃ ফেরদৌস কর্তৃক অপহৃতা। এই তো ধর্মান্ধদের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম।

কিন্তু এই জলন্ত পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম কি শুধু জ্বলতেই থাকবে? আর কতকাল জ্বলবে? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যতক্ষণ না জুম্মদের উপর প্রজ্বলিত সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আগুন নেভানো হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত হয়তো জ্বলতেই থাকবে পার্বত্য চট্টগ্রাম। একটি জনগোষ্ঠীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটা নিয়ে নিজস্ব ভূমে বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হল মানব জাতির শাশ্বত অধিকার। আজ জুম্ম জনগোষ্ঠী একই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আর জুম্ম জনগোষ্ঠী আজ যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে সেই জনগোষ্ঠীও ১৯৭১ সালে একইরূপ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছে। বড়ই পরিহাসের বিষয় সেই বৃহৎ জনগোষ্ঠী আবার আজ অন্য এক নিপীড়িত ও শোষিত জুম্ম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ধ্বংস করতে উদ্যত ও গোটা জুম্ম জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তি ঘটাতে বদ্ধপরিকর।

তবে এই সমস্যার কি কোন সমাধান নেই? কোন্ পথে আসবে এর সমাধান? এটা বাস্তব যে, যে কারণে যে সমস্যার উৎপত্তি সেই কারণগুলির মূলোচ্ছেদেই সেই সমস্যার সমাধান। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানও আসতে পারে এর মূল কারণগুলোর মূলোচ্ছেদের মাধ্যমে। মূল কারণের সমাধান না করে যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহলে তা হবে মূল রোগের চিকিৎসা না করে উপসর্গের চিকিৎসার সামিল। যেমন— বিগত বি এন পি সরকার ভারতে অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীদের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই জুম্ম শরণার্থীর সমস্যা মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে উদ্ভূত সমস্যা। সরকার বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জুম্ম জনগণের ভূমি বেদখল, উচ্ছেদকরণ, নির্যাতন, হত্যা তথা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কারণে জীবনের নিরাপত্তার জন্য এই শরণার্থীরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান ভূমি অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া কি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব? তাই যারা আজ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের অধিকাংশই তো ফেরৎ পায়নি তাদের বেদখল হয়ে যাওয়া জমি! আজ তারা নিরাপত্তাহীনভাবে অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। একারণেই ১৯৭৮, ১৯৮১ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেও জুম্মদের বার বার আশ্রয় নিতে হয়েছে ভারতে। কিন্তু পরিহাসের বিষয়, বিগত বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নামে জনসংহতি সমিতির সাথে পরপর ১৩ বার সংলাপ চালালেও মূলতঃ জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ আনার অপচেষ্টাই করেছিল। ফলে মূল সমস্যা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যায়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধানের জন্য এই সমস্যার মূল কারণগুলোর সমাধান করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বপ্রথম জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমির অধিকার সংরক্ষণ ও জুম্ম জনগণের জন্য স্বায়ত্বশাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার।

মূলতঃ দেশের জাতীয় সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক ও শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতিই সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ভূমির অধিকার তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতির স্বকীয়তার অধিকার সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। তাই বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র যেমন ভারত, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ইত্যাদি উন্নত দেশে পৃথক শাসন ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব

রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বকীয়তা, সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে। আর এটা সম্ভব হবে বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে, সামরিক অথবা অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নহে। এক্ষেত্রে সরকারী দলকে বেশী এগিয়ে আসতে হবে আর দেশের অন্যান্য বিরোধী দলগুলোকে পুর্ণ সহযোগিতা দিতে হবে। এটাই হবে বিরাজমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান। বলাবাহুল্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিও বিগত বিএনপি সরকারের সাথে দ্বিতীয় সংলাপে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সংশোধিত পাঁচ দফা দাবীনামা উত্থাপন ও সরকারের কাছে পেশ করেছিল। জনসংহতি সমিতি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ মনে করে যে, বর্তমান মুহূর্তে এই সংশোধিত পাঁচদফা দাবী বাস্তবায়নের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। বস্তুতঃ বর্তমান মুহূর্তে একমাত্র এটাই হবে এসমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান।

কল্পনা চাকমা অপহৃতা—অতপর ঃ

সুশ্রী পল্লবী

বাংলাদেশের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বিগত ১১ই জুন ও ১২ই জুনের মধ্যরাতে বাঘাইছড়ি থানার কজোইছড়ি আর্মি ক্যাম্পের লেঃ ফেরদৌস এর নেতৃত্বে সেনা ও ভিডিপি সদস্যদের একটি চিহ্নিত দল নিউ লাইল্যাঘোনায় আকস্মিক হানা দিয়ে হিল উইমেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদিকা মিস কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করে। সাধারণ পোষাকে ছদ্মাবরণে উক্ত সশস্ত্র দলটি রাতের অন্ধকারে ন্যক্কারজনক এই কার্য সমাধা করার অপচেষ্টা করলেও কল্পনা চাকমার বড় দুই ভাই কালীচরণ (কালিন্দী কুমার) ও ক্ষুদিরাম (লাল বিহারী) সহজেই দুর্বৃত্তদের চিনে ফেলে। অপহরণকারীরা যখন কল্পনাদের বাড়ী ঘেরাও করে দরজা খুলে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছিল তখন বাড়ীতে ছিলেন কল্পনা চাকমা, তার মা বাধুনী চাকমা, বড় দুই ভাই কালীচরণ ও ক্ষুদিরাম এবং কালীচরণের স্ত্রী। ক্ষুদিরাম ঘুম থেকে জেগে উঠে লণ্ঠন হাতে দরজা খুলতে যাবার আগেই লেঃ ফেরদৌস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা জোরপূর্বক দরজায় আঘাত করে বাড়ীতে ঢুকে পড়ে শক্তিশালী টর্চ লাইটের আলোয় তার দৃষ্টিশক্তি সাময়িক অচল করে দেয় এবং তার হাতের লণ্ঠন নিভিয়ে ফেলে। সাথে সাথে অপহরণকারীদের একজন ক্ষুদিরামের চোখে কাপড় বেঁধে দেয়ার আগেই ক্ষুদিরাম হাত দিয়ে টর্চের উজ্জ্বল আলো খানিকটা বাধা দিয়ে এক পলক দেখে তিনজনকে চিনতে পারে। তারা হচ্ছে কজোইছড়ি ক্যাম্পের লেফটেনান্ট ফেরদৌস এবং ভিডিপি কম্যাণ্ডার নুরুল হক (মুন্সী মিঞার ছেলে) ও অপর ভিডিপি সদস্য সালেহ আহম্মদ। অতপর কোন কিছু বুঝে উঠতে না উঠতেই ক্ষুদিরামকে টেনে হিচড়ে পার্শ্ববর্তী কাপ্তাই হ্রদের পানির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়। একই সময়ে অপর তিন অপহরণকারী কল্পনা চাকমা ও তার অন্য ভাই কালীচরণকে একইভাবেই চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় একই দিকে নিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরামকে হাঁটু বরাবর জলে নামতে বাধ্য করে সশস্ত্র অপহরণকারীরা। অসহায় ক্ষুদিরাম জলে নামার সাথে সাথে লেঃ ফেরদৌস গুলি করার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের কথা শুনে ক্ষুদিরাম মুহূর্ত বিলম্ব না করে হ্রদের পানিতে ঝাঁপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ শোনা যায় এবং কালীচরণ নিজেও একই পরিণতির কথা ভেবে চোখের বাঁধন এক ঝটকায় খুলে পালাতে থাকে। এই সময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার শব্দ ও তার ছোট বোন কল্পনার "দাদা" "দাদা" চিৎকার শুনতে পান কালীচরণ। সৌভাগ্যবশতঃ এদিকে ক্ষুদিরাম ও কালীচরণ অক্ষত অবস্থায় প্রাণে বেঁচে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতে সক্ষম হলেও তাদের আদরের ছোট বোন কল্পনা ফিরেনি। দুর্বৃত্ত সেনা কর্মকর্তা লেঃ ফেরদৌস কর্তৃক আজ অবধি কল্পনা চাকমা অপহৃতা রয়েছে। মৃত বা জীবিত কোন অবস্থাতেই কল্পনার খোঁজ মিলেনি। এই হল কল্পনা চাকমা অপহরণের সাম্প্রতিক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

জানা গেছে ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখ গ্রামে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের জের হিসেবে নিউ লাইল্যাঘোনার আশেপাশে ইসহাক নামের এক অনুপ্রবেশকারী নিখোঁজ হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর তরফে উক্ত নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে শান্তি-বাহিনীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এলাকায় সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেয়া হয়। ফলে একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বাঘাইছড়িতে আগে থেকেই বিরাজ করছিল। এদিকে বাগড়াছড়িতে মার্চ মাসের ৭ ও ৩১ তারিখ যথাক্রমে অমর বিকাশ চাকমা ও ক্যজয় মারমা পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত হওয়ার ঘটনায় সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চলতে থাকে। বাঘাইছড়িতেও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কর্মীদের সাথে একযোগে আন্দোলনে অংশ নেয় হিল উইমেনস্ ফেডারেশনে ছাত্রী কর্মীরা। আগের যে কোন সময়ের মত সেবারও কল্পনা চাকমা অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

ইতিমধ্যে ইসহাকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিউ লাইল্যাঘোনা গ্রামের নিকটবর্তী সেনা ছাউনী কজোইছড়ি ক্যাম্পের কুখ্যাত লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে এলাকাব্যাপী সামরিক দমন পীড়ন চলতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে ১৯শে মার্চ লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী নিউ লাইল্যাঘোনা গ্রামে একদল সেনাবাহিনী গ্রামবাসীদের অত্যাচার ও ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। উক্ত ঘটনায় আর্মিরা ১০ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে ও ৭টি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এসময় কল্পনা চাকমা সেনাবাহিনীর উক্ত নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং লেঃ ফেরদৌসের সাথে তার বাক্‌বিতণ্ডা হয়। সেইদিনের কল্পনার জোড়ালো প্রতিবাদ সেনা অফিসারকে যথেষ্ট বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিলেও তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। অতপর অনেক দিন গড়িয়ে গেছে। জুম্ম জনগণের উপর সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে, জুম্ম নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বরাবরই কল্পনা চাকমা সক্রিয় ও সোচ্চার থাকে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও নিজের সংগঠন হিল উইমেনস ফেডারেশনের অবিরাম সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতে থাকতে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সামনে এসে হাজির হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে কল্পনা চাকমাও সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাঙামাটি আসনের এক নির্দল প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা সার্বক্ষণিক কাজে জড়িয়ে যায়। ঘটনার আগের দিনই সে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বাড়ীতে ফিরে যায়। ১২ই জুন বাংলাদেশের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দেশের সকল জনগণের দৃষ্টি তখন নির্বাচনের দিকে। নির্বাচনী মৌসুমে সবার মনোযোগ নির্বাচন ও তার ফলাফলের দিকে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। দেশের প্রচার মাধ্যমসমূহও তখন নির্বাচন নিয়েই ব্যস্ত। তাছাড়াও আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে, নির্বাচন পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে তখন চলছিল সেনা টানাপোড়ন এবং অস্থিতিশীল অবস্থা। সেনা প্রধানকে বাধ্যতামূলক অবসর দান এবং সামরিক প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের আকস্মিক রদবদল সার্বিক করে তোলে। অতএব এটাই ছিল মোক্ষম সময়। লেফটেনান্ট ফেরদৌস তার পদস্থ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সম্ভবত এই সুযোগটাই সদ্ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লেঃ ফেরদৌস চট্টগ্রাম সেনা নিবাসের তদানিন্তন জি ও সি মেজর আজিজুর রহমানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। একথা আজ নিঃসন্দে বলা যায় যে লেঃ ফেরদৌস এই সুযোগের অপেক্ষাই করছিল। অপহরণ ঘটনাটি তাই কোন আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ইহা একটি সুপরিকল্পিত অপহরণ। কল্পনার দুই ভাইকেও চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে গিয়ে গুলি করার নির্দেশ অনেকটা নাটকীয়। হয়তো বা কল্পনার ভাইদের গুলি করে হত্যার কোন কথাই ছিল না। তবে গোলাগুলির শব্দে আতংকগ্রস্থ করে তাদের পালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়ে কল্পনার অপহরণকে সহজতর করার ব্যাপারটিও উড়িয়ে দেয়ার কোন অবকাশ নেই। অপহরণের নায়ক লেঃ ফেরদৌস ও তার দল নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করে যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি ব্যর্থ হয়েছে গোটা ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার ক্ষেত্রেও। ঘটনাত্তোর সামরিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকাটা অনেকটা কুলো দিয়ে মরা হাতী ঢেকে রাখার অপচেষ্টার মতই। অপরদিকে কল্পনাকে উদ্ধারের দাবীতে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

১২ই জুন ক্ষুদিরাম ও বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সম্রাটসুর চাকমা কল্পনার খোঁজে কজোইছড়ি ক্যাম্পে গেলে লেঃ ফেরদৌস কিছুই না জানান ভান করে এবং গালিগালাজ করতে থাকে। নির্বাচনী দায়িত্বের অজুহাত দেখিয়ে ব্যস্ত সমস্ত উক্ত সামরিক কর্মকর্তা কল্পনা বিষয়ে কোন কথাই শুনতে বা বলতে আগ্রহ দেখায়নি। অগত্যা ক্ষুদিরাম ও সম্রাটসুর ক্যাম্প থেকে ফিরে আসে। এদিকে কল্পনার অপর ভাই কালীচরণ বাঘাইছড়ি থানার নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে দেখা করে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে। বাঘাইছড়ি থানার ওসি সালাউদ্দীনের সাথেও দেখা

করে কালীচরণ এফ আই আর (First Information Report) নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানান। কালীচরণ যখনি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে চিহ্নিত অভিযুক্তর মধ্যে লেঃ ফেরদৌস ও ভিডিপি সদস্যদের নাম উল্লেখ করে তখন ওসি বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান এবং কালীচরণের মৌখিক বর্ণনা লিখতে গিয়ে বড় ধরণের ঘাপলাটা করে বসেন। অর্থাৎ কালীচরণ ঠিক যেভাবে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা এবং দোষীদের নামোল্লেখ করে যেভাবে ওসি সাহেব না লিখে নিজের সুবিধামত নিজের ভাষায় এফ আই আর লিখে নেন। কাজেই কালীচরণের জবানবন্দীর সাথে দায়েরকৃত এফ আই আর এর বক্তব্যে অমিল রয়ে যায়।

১৪ই জুন, ১৯৯৬ ইং সদ্য বিবাহিত সূর্যসেন চাকমা, গ্রাম বাঘাইছড়ি, থানা-বাঘাইছড়ি হাটের দিনে তুরছড়ি বাজারে কেনাকাটার জন্য যায় ও বেলা থাকতে সে বাড়ীতে ফিরে আসে। কিন্তু ভুলক্রমে সে ক্রয় করা জিনিষপত্র বাজারে ফেলে আসে। ফলে সে উক্ত জিনিষপত্র নিয়ে আসার জন্য পুনরায় বাজারে যেতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে গ্রামের অধিকাংশ লোক নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে আসে। তাকে দেখে একাকী তুরছড়ি বাজারের ভিডিপি (Village Defence Party) এর পোষ্ট কম্যাণ্ডার মোহম্মদ শাহাজাহান ও বাজারস্থ অন্যতম অনুপ্রবেশকারী মোহম্মদ আলী সূর্যসেন চাকমাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। ১৭ই জুন, ১৯৯৬ ইং সূর্যসেন চাকমার লাশ তার গ্রামের পাশের ঝোঁপঝাড়ে পাওয়া যায়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, জমি বেদখল নিয়ে সূর্যসেন চাকমার সাথে ভিডিপি কম্যাণ্ডার মোহাম্মদ শাহজাহানের বিবাদ ছিল বলে প্রকাশ।

তারপর দেশে সাধারণ নির্বাচনের হাওয়ায় সবাই তালমাতাল হয়ে যায়। নির্বাচন ও তার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে কম বেশী সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেনস ফেডারেশন সহ কতিপয় ব্যক্তির প্রতিবাদ ও বিবৃতির মধ্যে নির্বাচনোত্তর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চাপা পড়ে থাকে কল্পনা অপহরণের বিষয়টি। ১৪দিনের মাথায় ২৫শে জুন উক্ত তিনটি সংগঠনের উদ্যোগে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে কল্পনার অপহরণের প্রতিবাদে ও তার দ্রুত উদ্ধারের দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে জুন ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করা হয় এবং পরদিন অর্থাৎ ২৭শে জুন সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে অবরোধের ডাক দেয়া হয়। একইদিন ঢাকার প্রেসক্লাবের সামনে অনশন কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য স্থানের মত বাঘাইছড়িতেও ২৭শে জুন অবরোধ কর্মসূচীর সমর্থনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মীরা সকাল থেকে স্থানীয় যানবাহন শ্রমিক মালিক সমিতির সাথে দেখা করতে যায়। ছাত্র কর্মীরা যানবাহন শ্রমিক ও মালিক সমিতির সদস্যদের সেদিন যানবাহন চালনা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। যদিও তাদের কাছ থেকে ছাত্ররা ইতিবাচক সাড়া পায়নি। তবুও যানবাহন স্টেশনগুলোতে তারা ধর্ণা দেয়। এরপর ছাত্র কর্মীরা যখন রাস্তা অবরোধ কর্মসূচী সফল করতে পিকেটিং করতে যায় তখনি এক বাঙালী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর সাইকেল আরোহী পিকেটিংরত ছাত্রদের একজনকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধাক্কা দেয়। এতে বাঙ্গালী যুবক ও জুম্ম ছাত্রদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে উত্তেজিত অনুপ্রবেশকারীদের একটি দল জীবঙ্গছড়া (বাবুপাড়া) নামক স্থানে পাহাড়ী ছাত্রদের উপর আক্রমণ করে। লাঠিসোটা, দা, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি ধারালো অস্ত্রসজ্জিত অনুপ্রবেশকারীদের দলটি জীবতলী মৌজার জীবংগছড়াতে একটি জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই সময় বাড়ীর মালিক তার বাড়ীর উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে এক অনুপ্রবেশকারীকে আহত করে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মীরাও তাদের আহুত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে আক্রমণকারীদের উপর পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলে বাঙালী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের অসংখ্য অস্ত্রধারী লোক ভিডিপি-দের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় আরো সংঘটিত হয়ে জুম্ম ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় এই সংঘর্ষের এক পর্যায়ে সংঘর্ষ থামাতে আসা পুলিশের হাত থেকে নুরুল ইসলাম নামের ভিডিপি

সদস্য রাইফেল কেড়ে নিয়ে জুম্ম ছাত্রদের দিকে গুলি ছুড়তে থাকে। ফলে ঘটনাস্থলেই রূপম চাকমা (রতন), ১৮ বৎসর পিং-হিরংগ চাকমা, গ্রাম-ঝগড়াবিল, ৩৭৬ তিনটিলা মৌজা, বংগলতলী ইউনিয়ন--গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। স্থানীয় রূপকারী হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র রূপম চাকমা গুলিবিদ্ধ

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথে অনুপ্রবেশকারীরা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তার দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলে। তার মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা করলে আরো তিনজন জুম্ম ছাত্র আহত হয়। একইদিন অবরোধ কর্মসূচীতে যোগ দিতে আসার পথে দুই জুম্ম ছাত্র মনতোষ চাকমা (২০), পীং—পুর্ণেন্দুলাল চাকমা, গ্রাম—বংগলতলী, পিন্টু (সুকেশ) চাকমা (২০), পীং—হামেশ কুমার চাকমা, গ্রাম—খেদারাছড়া এবং এক কৃষকের ছেলে সমর বিজয় চাকমা (২২), পীং—প্রতি চাকমা, গ্রাম মরিজাবন ছড়া তুলাবান নামক স্থানে মুসলিম ব্লক পাড়ায় অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা অতিক্রান্ত ও পরে নিখোজ হয়ে যায়। তাদের লাশ আজো পাওয়া যায়নি।

এভাবে ঘটনা প্রবাহক্রমে মারাত্মক আকার নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। ঢাকাতেও জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা বিরামহীনভাবে বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালায়। অবশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংস্থা, নারী সংগঠন এবং প্রচার মাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে ২৩শে জুন SHED (Society For Environment and Human Development)-এর সরকারী গবেষক এফ, এম, এ, সালাম, শিশির মোড়ল, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সহায়তায় বাঘাইছড়ির নিউ লাইল্যাঘোনা কল্পনাদের বাড়ীতে তথ্য সংগ্রহে আসেন। তারা স্থানীয় প্রশসানের সাথেও কথাবার্তা বলেন এবং ঢাকায় ফিরে তাদের সরেজমিনে প্রতিবেদন ও লেখালেখি প্রকাশ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার গোষ্ঠী কল্পনার মুক্তির দাবীতে বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদান করতে থাকে, ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১) ৯ই জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। কমিটির আহবায়ক ব্যারিষ্টার লুৎফর রহমান শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বক্তব্য রাখেন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দিলীপ বড়ুয়া, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের ফয়জুল হাকিম, গারো সংগঠনের রেমন আরেং, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কবিতা চাকমা, আইনজীবী খালেদা খাতুন ও আবু সাইদ খান এবং জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও বিশিষ্ট বামপন্থী আনু মোহাম্মদ।

২) ১৪ই জুলাই ১২টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলামের সাথে দেখা করেন।

—অবিলম্বে কল্পনা চাকমাকে উদ্ধার করা,

—অপহরণ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত,

—দোষীদের আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা,

—কল্পনার পরিবারবর্গের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,

গত ২৭ জুন নিখোঁজ চার ব্যক্তিকে অবিলম্বে উদ্ধার করা,

—ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দান ও

—এ ধরণের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে ১২ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১২টি সংগঠনের মধ্যে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, অধিকার, উবিনীগ, মহিলা পরিষদ, ল' রিভিউ, নারী গ্রন্থনা প্রবর্তনা লিগ্যাল এইড এবং সার্ভিসেস ট্রাষ্ট, নাগরিক উদ্যোগ, সম্মিলিত নারী সমাজ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ী গণ পরিষদ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ।

৩) ২২শে জুলাহ নারী সংগঠনসমূহের একটি সম্মিলিত গোষ্ঠী 'সম্মিলিত নারী সমাজের' পক্ষ থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। রোকেয়া কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফারদা আক্তার, শিরীন খালেদা খাতুন, ফোজিয়া খন্দকার ইভা, বর্তিকা চাকমা, সঞ্চয় চাকমা।

৪) ৭ জুলাই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয় শাখা আয়োজিত সভায় কল্পনা চাকমা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানানো হয়।

৫) ২৫শে জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটির উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকারকে কল্পনা চাকমার উদ্ধারের দাবী জানিয়ে স্মারকলিপি দেয়া হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন খুশী কবীর, সুলতানা কামাল, আনু আহম্মদ, ফরিদা আওশর, নাজমা নাজনিন প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন যেমন ওয়ার্কার্স পার্টি, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্র-যুব-ঐক্য পরিষদ বিবৃতির মাধ্যমে কল্পনা অপহরণের তীব্র প্রতিবাদ ও তার মুক্তির দাবী জানান।

দেশের বিভিন্ন সংগঠনের জোড়ালো প্রতিবাদ চাপের ও পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের দূতাবাস সমূহ বাংলাদেশ সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে। দেশে এবং দেশের বাহিরে থেকেও বহু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা কল্পনা চাকমার বিষয়ে বর্তমান সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। দেশে বিদেশে যখন কল্পনার অপহরণ ঘটনায় ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে যায় ঠিক তখন নাটকীয়ভাবে সামরিক কর্তৃপক্ষের দৌড়ঝাঁপ লক্ষ্য করা যায়।

১৮ই জুলাই রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির আকাশে আকস্মিক দেখা যায় প্রচারপত্র বৃষ্টি। দূর আকাশ থেকে নেমে আসে হাজার হাজার প্রচারপত্র। সামরিক হেলিকপ্টার থেকে ছোঁড়া হয় এই প্রচারপত্র। "কল্পনা চাকমার খোঁজ দিন, ৫০,০০০'০০ টাকা পুরস্কার নিন" শিরোনামযুক্ত ও কল্পনার ছবিসহ এই প্রচারপত্রে কল্পনা চাকমার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ও নিশ্চিত সংবাদ প্রদানকারীকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণার পাশাপাশি বলা হয়েছে সঠিক সংবাদ নিকটস্থ নিরাপত্তা বাহিনীর জোন/ক্যাম্প/থানা/জেলা প্রশাসন অথবা ২৪ পদাতিক ডিভিশন, সদর দপ্তর, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে জানাতে। সদর দপ্তর ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, টেলিফোন ৬২৪২৭৮ (চট্টগ্রাম) ঠিকানা সম্বলিত উক্ত প্রচার প্রচারপত্রে কল্পনার সঠিক সংবাদদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে আশ্বাস ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশে সদ্য ক্ষমতাসীন সরকার ও বেসামরিক প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সেনাবাহিনীর বিভাগীয় সদর দপ্তরের পক্ষে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণায় পার্বত্যাঞ্চলের জনমনে ব্যাপক সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রের আভাস পরিলক্ষিত হয়। পত্র পত্রিকা সমূহে এই প্রচারপত্র বিলির ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর দেশবাসীর মনেও নানা সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে। সবাইকে হতবাক করে দেয়া উক্ত প্রচারপত্রে কিছু ইচ্ছাকৃত প্রিন্টিং মিসটেক (ছাপার ভুল) লক্ষ্য করা যায়। যেমন কল্পনা চাকমার অপহরণের ঘটনাটি ২৮শে ফেব্রুয়ারী সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়। কল্পনা চাকমার পিতার নামও গুণ রঞ্জনের জায়গায় লেখা হয় কুন রঞ্জন। এই প্রচারপত্রে রহস্যের জাল ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই ২২শে জুলাই কল্পনার অপহরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের সদর দপ্তর, চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে দপ্তরের তথ্য অফিসার মোঃ জসীমউদ্দিনের স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি সারাদেশে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি "উদ্ভূত সন্দেহ দূরীকরণার্থে ও পরিপূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণের স্বার্থে" ইস্যু করার কথা বলা হলেও মূলতঃ তার প্রতিক্রিয়া হয়ে যায় উল্টো। সামরিক কর্তৃপক্ষের এই প্রেসবিজ্ঞপ্তি সন্দেহ দূরীকরণের পরিবর্তে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি জনগণের সন্দেহই বাড়িয়ে তোলে। দীর্ঘ ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেনা কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণিত করার জন্য পরিপূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়েছে। অসংখ্য বানোয়াট ও মিথ্যার ফুলঝুড়িতে ভরা তাদের প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে নিজেদের ধোয়া তুলসী পাতা হিসেবে জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রাণপন চেষ্টা করেও প্রকারান্তরে কল্পনা অপহরণ ঘটনায় সেনাবাহিনী জড়িত থাকার এবং তাদের দুর্বলতার অবস্থানকেই প্রকাশ করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তির প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১২ই জুন কল্পনা চাকমার ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা বাদী হয়ে বাঘাইছড়ি থানায় যে অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন তা পুলিশের তদন্তাধীন রয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাঙামাটি আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয় কেতন চাকমার পক্ষে পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেনস ফেডারেশনের নির্বাচনী প্রচারণায় জড়িত থাকা এবং এক্ষেত্রে শান্তিবাহিনীর সংশ্লিষ্টতার সাজানো অজুহাত দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের নির্বাচিত প্রার্থী দীপংকর তালুকদারের জনপ্রিয়তার কারণে শংকিত উক্ত তিন সংগঠনের কথিত হুমকি ও হয়রাণিমূলক মিথ্যা ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বর্তমান নির্বাচিত সরকারের সহানুভূতি আদায়ের প্রয়াস ফুটে উঠেছে। নির্বাচন পূর্ব বিভিন্ন নির্যাতন, অপহরণ ঘটনার উল্লেখ করে এসব ঘটনায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এমনকি শান্তিবাহিনী জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে কল্পনা অপহরণের বিষয়টি ভিন্ন খাতে নিয়ে যাবার অপচেষ্টা দিবালোকের মত স্পষ্ট। এসব অভিযোগের ধারণা অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, কল্পনা অপহরণের নায়ক যে লেঃ ফেরদৌসের কথা বলা হচ্ছে তাকে শান্তিবাহিনী ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অবৈধ কার্যকলাপ-এর বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনায় একজন সফল অফিসার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১১ই জুন রাতে লেঃ ফেরদৌস নির্বাচন উপলক্ষে উগলছড়ি ক্যাম্পে যায় এবং সেদিন উক্ত ক্যাম্পে একজন মেজর, একজন ক্যাপ্টেন ও একজন লেফ্‌টেনান্ট পদের অফিসারসহ মোট চার জন অফিসার ও ৮০/৯০ জন সৈনিক উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করা হয়। একই সাথে সামরিক কঠোর শৃংখলার দোহাই দিয়ে এবং এত লোকের উপস্থিতিতে ক্যাম্প থেকে মাত্র ৮০০ গজ দূরে কল্পনা চাকমার বাড়ীতে অপহরণের ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে—সেদিন রাতে উগলছড়ি ক্যাম্পে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় লেঃ ফেরদৌস নির্বাচনী দায়িত্বে আগত প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ বেশ কয়েকজন নির্বাচনী কর্মকর্তার প্রাইমারী স্কুলে রাত্রি যাপন করে থাকে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তির উক্ত বর্ণনার ঠিক পরের অনুচ্ছেদে আরো উল্লেখ করা আছে যে, ১১ জুন রাতে উগলছড়ি ক্যাম্পে চারজন অফিসারসহ একসঙ্গে অফিসার বাসস্থানে উক্ত লেঃ ফেরদৌস রাত্রি যাপন করেছে। উপস্থিত ঊর্দ্ধতন অফিসারের বিনানুমতিতে এবং সকলের অগোচরে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে তোয়াক্কা না করেও চাকুরিচ্যুতির ঝুঁকি নিয়ে একা একা একজন অফিসারের পক্ষে ক্যাম্পের ৮০০ গজ দূরে যাওয়া যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না।

এখানেই অপেক্ষাকৃতভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি কত বড় বানোয়াট। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত উপরোক্ত অফিসারের রাতের অন্ধকারে ৮০০ গজ দূরে একা একা যাওয়ার বিষয়টি যুক্তিগ্রাহ্য নয় কথাটি কত হালকা। উক্ত লেঃ ফেরদৌস আদতে ১১ই জুন রাতে কার সাথে কোথায় রাত্রি যাপন করেছে? এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি ২৪ পদাতিক ডিভিশনের কর্তৃপক্ষ। এক জায়গায় লেখা হচ্ছে যে ক্যাম্পের জায়গা সংকুলান না হওয়াতে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সাথে উগলছড়ি প্রাথমিক স্কুলে রাত্রি যাপন করে। ঠিক কয়েক লাইন পরে আবার বলা হচ্ছে যে অন্য তিনজন সামরিক অফিসারের সাথে অফিসার ম্যাচে রাত্রি যাপন করে। তাহলে কোনটা ঠিক? কল্পনা অপহরণের ব্যাপারে উদ্ভূত সন্দেহ দূরীকরণার্থে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের এ কোন্ মিথ্যার বেসাতি? এক মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে দশ মিথ্যা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করায় আরো গভীর সন্দেহ উদ্রেক করে।

কল্পনা চাকমার অপহরণ বিষয়ে পি জি পি, পিসিপি, ও এইচ ডব্লিউ এফ-এর বিবৃতির সাথে এফ আই আর এর কোন মিল খুঁজে না পাওয়ার কথাও ২৪ পদাতিক ডিভিশনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। তা মিলবেই বা কিভাবে। কল্পনার ভাই কালীচরণের মৌখিক বর্ণনা লিখতে গিয়ে বাঘাইছড়ি থানার ওসি অন্যতম যোগসাজসকারী সলোউদ্দীন তো ইচ্ছা করে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেননি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো দাবী করা হচ্ছে যে কল্পনার বাড়ীতে সেনাবাহিনীর তদন্তকারীরা কল্পনার পরিধেয় বস্ত্র, বই পুস্তক ও নিত্য ব্যবহার্য কোন সামগ্রী খুঁজে পায়নি। কাজেই কল্পনা নিজেই গা ঢাকা দিতে পারে কিংবা কে বা কারা সীমান্তের ওপারেও নিয়ে যেতে পারে। পাহাড়, পর্বত গহীন বনজঙ্গলে ঢাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে কোথায় খুঁজে পাবে সেনাবাহিনী কল্পনাকে ! আবার কল্পনার পাশপোর্ট আছে দোহাই দিয়ে তাকে বিদেশে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে দেশী বিদেশী বিভিন্ন ফোরামে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টি তুলে ধরার অপচেষ্টা বলেও সন্দেহ করছে সেনা কর্তৃপক্ষ। কল্পনার হারিয়ে যাওয়ায় জন্য অনেকের সাথে সেনা কর্তৃপক্ষও গভীর চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত বলে দাবী করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাসবাণী রেখে প্রয়োজনে উগলছড়ি ক্যাম্পে তল্লাসী চালাতেও বলেছে সেনা বাহিনী। ২৪শে জুন তারা নাকি রাঙামাটি জেলা প্রশাসককে বিশেষভাবে তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়েছে যদিও জেলা প্রশাসক ৮ই জুলাই লিখিত পত্রে এরকম আলাদা তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যন করেছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেনা কর্তৃপক্ষ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ এনেছে। ১৯৭৬ সাল থেকে পার্বত্য এলাকায় তাদের পেশাগত কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হতাহতের হিসাব দেখিয়ে দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর তথাকথিত ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতে না দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মোদ্দাকথা ২৪ পদাতিক ডিভিশনের উপরোক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিভ্রান্তিকর, স্ববিরোধী ও ভাওতায় পরিপূর্ণ। ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে গিয়ে সেনা কর্তৃপক নিজেদের সাধুতা ও অন্যদের দোষী প্রমাণে প্রাণপণ অপপ্রয়াস চালিয়েছে মাত্র। বস্তুতঃ সেনা কর্তৃপক্ষ যেমনি প্রত্যক্ষভাবে এই রহস্যের ভেতর নিজেদের জড়িত করেছে তেমনি একইভাবে তাদের ও সরকারের জারজ সন্তান পার্বত্য গণ পরিষদ, নাগরিক কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় শান্তি ও সমন্বয় পরিষদ, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, পিসিপি পিজিপি সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি ইত্যাদি ভুঁইফোড় ও নামসর্বস্ব সংগঠনগুলির মাধ্যমে গোটা পরিস্থিতিকেভিন্ন খাতে চালিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। যেমন বিগত ৪ঠা আগষ্ট বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন এক সাংবাদিক সম্মেলনে কল্পনা চাকমা সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেছে তাতে বলা হয়েছে যে কল্পনা চাকমাকে সেনাবাহিনী কর্তৃক অপহরণ করা হয়নি, কল্পনা চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করেছে, কল্পনা চাকমা নিখোঁজ হওয়ার পর তার মা বাধুনী চাকমার সাথে দু'বার যোগাযোগ করেছে ইত্যাদি। অথচ ১৮ই আগস্ট, ১৯৯৬ইং তারিখে কল্পনা চাকমার মাতা শ্রীমতী বাধুনী চাকমা জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তার বরাত দিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে—সরকার ও তার সেনাবাহিনীর জারজ সন্তান ও মদদপুষ্ট বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের বিবৃতি সম্পূর্ণ বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। লেঃ ফেরদৌস কর্তৃক কল্পনা চাকমাকে অপহরণের নাক্কারজনক ঘটনাকে আড়াল করার হীন উদ্দেশ্যেই তথাকথিত মানবাধিকার কমিশন এসব তথ্যাদি প্রকাশ করেছে। শ্রীমতী বাধুনী তার বিবৃতিতে বলেন যে বিগত ৪ঠা আগষ্ট বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের একটি দল ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি সেনা জোনে যায়। এই দলটি সেখান থেকে তার বাড়ীতে যায়। মানবাধিকার কমিশনের দলের সঙ্গে২০ জন বি ডি আর ও ৭/৮ জন স্থানীয় অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলমান ছিল। মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা চাকমা ভাষা জানা স্থানীয় এক বাঙালীর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। শ্রীমতী বাধুনী বলেন, মানবাধিকার কমিশনের পরিবেশিত তথ্যের সঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা প্রশ্নের কোন মিল নেই। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি সম্পূর্ণ বানোয়াট। অপরদিকে বর্তমানে ভারতে আশ্রিত ৫০ সহস্রাধিক জুম্ম শরণার্থীদের পক্ষে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে ১২ই আগষ্ট, ১৯৯৬ইং প্রদত্ত ও বি বি সি-তে প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে কল্পনা চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের জুম্ম শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করছে এ তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক ! ফলে সেনাবাহিনী মহাবিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপী কানাঘুষা চলতে থাকে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে। এমত পারিস্থিতিতে সেনা কর্তৃপক্ষ

আবার বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন বোধ করে এবং ৬ই আগষ্ট পত্র পত্রিকায় আই এস পি আর-এর মাধ্যমে আরো একটি ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়। এতে বলা হয়েছে যে, কল্পনা চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করার ব্যাপারে চট্টগ্রাম এরিয়া সদর দপ্তরে কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোন কোন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন ধরণের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটানোর জন্য সেনা সদর দপ্তর বিষয়টির ব্যাখ্যা দেয়া যথার্থ বিবেচনা করেছে। এ সম্পর্কিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশের আগে সেনা সদর দপ্তর পুংখানুপুংখ পরীক্ষা করেছে ও অনুমোদন দিয়েছে।

অপহৃতা কল্পনাকে নিয়ে পুরো ঘটনার তালগোল পাকানো এবং সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ (একজন সামরিক কর্মকর্তার) বক্তব্য এতদিন চাপা থেকে যাচ্ছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন অন্যতম উপদেষ্টা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ ইউনুস কল্পনা চাকমা অপহরণ বিষয়ে টেলিফোনে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের কাছ থেকে জানতে চান। প্রতি-উত্তরে ঐ সামরিক কর্মকর্তা বিষয়টি 'হৃদয় ঘটিত' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। এই 'হৃদয় ঘটিত' বিষয়টি নয় পৃষ্ঠার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই কল্পনা অপহরণের ঘটনাটির বিষয়ে সেনাবাহিনী যত কিছুই বলছে সবই গোজামিল ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এদিকে বাঘাইছড়ি থানার ওসি ঢাকা থেকে আগত মোর্শেদ আলী খান নামে এক তদন্তকারীর কাছে স্বীকার করেছেন যে কল্পনার ভাই কালীচরণের দেয়া জবানবন্দিতে চিহ্নিত অপহরণকারীদের নাম থাকলেও বিভিন্ন অসুবিধার কারণে তদন্ত পরিচালনার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে কি সেই অসুবিধা যার কারণে ওসি সাহেব অনেক কিছু মুখ খুলে বলতে অপারগ? উক্ত তদন্তকারী যখন রাঙ্গামাটির পুলিশ সুপারের সাথে কল্পনার অপহরণ বিষয়ে কথা বলতে যান তখন আরো একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটে। রাঙ্গামাটির পুলিশ সুপার মোঃ নুরুল আনোয়ার বলেন যে তিনি একশভাগ নিশ্চিত কল্পনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। এই অপহরণ ঘটনার তদন্ত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কোন বাঁধা. বিপত্তি নেই। রাঙ্গামাটি আর্মির ব্রিগেডিয়ারও তাকে এলাকার একশ আশিটি সেনা ক্যাম্পের যে কোনটাতে সফর করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তদন্তকারী প্রতিবেদক যখন পুলিশ সুপারের কাছে জানতে চান যে তিনি এযাবৎ কয়টি সেনা ক্যাম্পে তল্লাসী চালিয়েছেন। প্রতি উত্তরে তিনি বলেন একটিও না। পাহাড় পর্বতের দুর্গম এই এলাকায় সফর করা যথেষ্ঠ দুরূহ ও কষ্টসাধ্য বলে তিনি স্বীকার করেন। স্বভাবতই আমাদের প্রশ্ন জাগে পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে তেমন তৎপর নয় কেন? সেনা প্রশাসনের তরফ থেকে কেবল রাঙ্গামাটি এলাকার একশ আশিটি সেনা ক্যাম্পে প্রয়োজনে তল্লাসী চালানোর মুখরোচক অনুমতি এবং অপরপক্ষে এযাবৎ একটি ক্যাম্পও পরিদর্শন না করার ঘটনায় আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। "ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই না" এ জাতীয় ভূমিকা আগেও সেনাবাহিনী অসংখ্য বার নিয়েছে। সেনা বাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে যাই বলুক না কেন একথা আজ দিবালোকের মতই পরিস্কার যে লেঃ ফেরদৌস প্রতিবাদী ও সংগ্রামী নেত্রী কল্পনাকে অপহরণ করেছে। একটি মেয়েকে অপহরণ করে যে কোন ক্যাম্পে লুকিয়ে রেখে বিষয়টি গোপন রাখা সেনাবাহিনীর মামুলী ব্যাপার। আর যেখানে নিম্নস্তরের সেপাইসহ উচ্চ পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তারাও বিষয়টি ভালোভাবেই জানে সেখানে একটি মেয়েকে লুকিয়ে রাখা বা গুম করে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার ঘটনা মোটেই অমূলক নয়। যেহেতু এরূপ ঘটনা অতীতে বহুবার আর্মিরা করেছে এবং আজো করে চলেছে।

কল্পনা নিখোঁজ, হারিয়ে গেছে, আত্মগোপন করেছে কিংবা ভারতের ত্রিপুরায় পালিয়ে গেছে এমন অনেক আজগুবি বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে। যত উদ্ভট ও বানোয়াট বক্তব্য প্রচার হোক না কেন সাধারণ মানুষ কিন্তু ঘটনাটি নিখোঁজ বলতে পারে না। স্বচক্ষে দেখা গেছে কে বা কারা কল্পনাকে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এটি একটি অপহরণ। এর কোন প্রতিশব্দ দিয়ে সত্যকে তালগোল পাকানোর অবকাশ নেই।

কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করা হয়েছে আজ তিন মাস হতে চলল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে দ্রুত

বিচার-বিভাগীয় তদন্ত হবে বলে আশ্বাস দিলেও অনেক দেরীতে কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করার দীর্ঘ ষাটষট্টি দিন পর ১৮ই আগষ্ট সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল জলিলের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির অপর দু'জন সদস্য হচ্ছেন চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াত হোসেন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অনুপম সেন। তবে তদন্ত কমিটি কিভাবে কাজ শুরু করেছে তা দেখার বিষয়। বলা বাহুল্য যদি তদন্ত কাজ চলতে থাকে তাহলেও জুম্ম জনগণের খুব বেশী আশ্বস্ত হওয়ার কারণ নেই। বড় জোর তদন্ত কমিটির রিপোর্ট করা হতে পারে। কোন বিচারই যে পাওয়া যাবে না এ কথা অনেকটা হলফ করেই বলা যায়। কেন না লোগাং গণহত্যা, নানিয়ার চর গণহত্যা ইত্যাদি অনেক ঘটনাতেও তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। সাধারণতঃ বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কমিটি তার রিপোর্ট দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে থাকে কিন্তু দোষী ব্যক্তির কিছু হয়েছে বলে আজও শোনা যায়নি। আর দোষী ব্যক্তি যদি সামরিকবাহিনীর কেউ হয়ে থাকে তাহলে তো শাস্তির প্রশ্নই আসেনা। নানা তালবাহানা করে, সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে ন্যায়ের বিচার নীরবেই নিভৃতে কেঁদেছে এতকাল। কাজেই কল্পনার অপহরণ ঘটনায় চিহ্নিত দোষীদের বর্তমান প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা যে তেমন কিছু করবে না বা করতে সাহস পাবেনা তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। কারণ ১২টি সংগঠনে প্রতিনিধি দলের নিকট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে কল্পনা চাকমার বিষয়টা হচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নহে। তার বক্তব্যে ইহা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে সামরিক প্রশাসন চলছে। যেখানে তার করণীয় কিছুই নেই। তাছাড়া সরকারের কাছে বিভিন্ন মহল থেকে বারবার দাবী করা সত্ত্বেও সরকার কল্পনা চাকমার উদ্ধারে কোন তড়িৎ বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি— করারও প্রয়োজনবোধ করেনি। অপহৃতা কল্পনা চাকমার উদ্ধার ও দোষীদের উপযুক্ত বিচার করার প্রেক্ষিতে যখন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে উঠতে থাকে তখনই প্রধানমন্ত্রী তথা সরকার একটা লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মাত্র। বস্তুতঃ এই তদন্ত কমিটিও লোক দেখানো দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে তা সহজেই অনুমেয়। তা সত্বেও এহেন ঘটনার নিন্দা, প্রতিবাদ এবং তার প্রতিবিধানের আহ্বান থাকছে যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করবে আর এটাই জুম্ম জনগণ তথা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী জনগণের একান্ত প্রত্যাশা।

অবশেষে যে বিষয়টি উল্লেখ্য সেটি হল— কল্পনা চাকমার অপহরণের ঘটনাটির মত জুম্ম নারী নির্যাতন পার্বত্য চট্টগ্রামে এই কিন্তু প্রথম নয়। এমন কি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। তথাকথিত অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত লক্ষাধিক সশস্ত্র বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানের কারণে প্রতিদিন কোন না কোন জায়গায় সেনা বাহিনীর সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ, অপহরণ, জোরপূর্বক বিবাহ, ধর্মান্তর, অশালীন আচরণ, হত্যা ইত্যাদি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছেই। ১৯৮৪ সালে মারিশ্যা বি ডি আর ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন শাম্‌স্ তুলাবানের কৃষ্ণা চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে জোর করে বিয়ে করে। সেই ক্যাপ্টেনকে মেজর পদে উন্নীত করে অন্যত্র বদলী করা হয়। ১৯৮৮ সালের ৮ই আগষ্ট দূরছড়ি বাজার ক্যাম্পে ১০ জন জুম্ম নারীকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে এবং একইদিন খাগড়াছড়ি গ্রামে সুমিতা চাকমাকে সহ আরো কয়েকজন যুবতীকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। ১৯৯১ সালের ২৪শে অক্টোবর মহালছড়ির গোলক্যাপাড়ায় ২৪ ই বি আর ও ২৭ ই বি আর-এর সদস্যরা মিসেস রঙপতি চাকমা স্বামী বৈকুন্ঠ চাকমা ও তার মেয়ে মিস্ চঞ্চলাকে ধর্ষণ করে। তারও আগে ২৭শে জুলাই '৯১ইং মহালছড়ি বাজারে আসার পথে মিস্ স্বপ্না চাকমা পীং সুবাস চন্দ্র চাকমা এক ভিডিপি সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। '৯২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী রাঙ্গামাটির খারিখ্যং আর্মি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মুকিব

মিস্ তাত্তরাং চাক্মাকে ধর্ষণ করে। একই সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী কাউখালী থানার উল্টাপাড়া গ্রামের তিনজন জুম্ম রমণীকে ধর্ষণ করেছে লেবাপাড়া ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন জাহির ও তার দলবল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী '৯২ নানিয়ার চরের সদর ক্যাম্পের মেজর আহসান ও সুবেদার তোফাজ্জল কৃষ্ণমাছড়া গ্রামের রবি কুমার চাক্মার স্ত্রী শশী বালাকে ধর্ষণের পর হত্যার চেষ্টা করে। '৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে ৫ তারিখ নানিয়ারচরের ডাকবাংলো আর্মি ক্যাম্পের (৮ম ইঞ্জিনীয়ারিং কোর) সেনা সদস্যরা সোনালী ও বাধনী চাকমা নামক দুই যুবতীকে অপহরণ করে। ১১ই ডিসেম্বর '৯১ইং জুরাছড়ির ক্যাম্প কমাণ্ডার সুবেদার তোফাজ্জল মিস্ ঝর্ণাদেবী চাকমাকে ধর্ষণ করে। এভাবে অহরহ ঘটছে নারী নির্যাতনের ঘটনা।

কেবলমাত্র ১৯৮৫-৯৫ পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জুম্ম নারী ধর্ষণ ও অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৪৬৯টি। কল্পনা অপহরণের কিছুকাল আগেও স্বপ্নারেখা নামে এক জুম্ম কিশোরীকে তুলাবান গ্রামে ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়। এভাবেই অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটাচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব ও দেশের নাগরিকদের তথাকথিত নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। অথচ এদেরকেই বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির গৌরব ও অহংকার বলে দাবী করা হয়ে থাকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্মকর্তারা এই ভেবেই প্রশান্তি ও সুখানুভব করে থাকে।

অনুভূতি

সুশ্রী-উজানা

(১)

আমরা কি শুধু নারী হয়ে থাকবো ?
আমাদের তো আছে সবকিছু—
চোখ, কান, নাক, হাত, পা,
আর রক্তে মাংসে ভরা অনুভূতি
তাইতো আমরাও মানুষ।
অথচ শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পদতলে
নারী শুধুই নারী, পুরুষ কেবলই পুরুষ!
পারিবারিক দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ
নারীর কাজ শুধু নারীরই সাজে, কিন্তু
সেই কাজ কি শুধু—
আঁতুর ঘর, রান্না ঘর আর শয়ন ঘর ?
তার চেয়ে কি বেশী কিছু নয় ?
হয়,— তার চেয়ে অ-নে-ক বেশী হয়
যদি শ্রেণী বিভক্ত সমাজের শেষ নিঃশ্বাস বয়।

(২)

আজ চারিদিকে শুধু বঞ্চনা ও ভীরুতা
পার্বত্য জনপদ তথা সমগ্র বিশ্বের—
নিপীড়িতা-মেহনতী মা বোনের ইজ্জত্
লুণ্ঠিত ও ধর্ষিত হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে
জুম্ম ললনা কল্পনাদের ভবিষ্যৎ।
তবু কেন আমরা নীরব-নির্বিকার ?
জলপাই রঙের দাপটে আর
উগ্রজাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদের করাল গ্রাসে
পার্বত্য জননীর চোখে আজ করুণ আকুতি
জুম্ম জাতি আজ বিলুপ্তপ্রায়!
তাইতো বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ হয়ে
আজ জ্বলে উঠবো কি ?

একতাবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করতে হবে

শ্রী সুপর্ণ

বিগত মার্চ মাসে বাঘাইছড়ি থানার জুম্ম জনগণ একতাবদ্ধভাবে মুসলমান বাঙালীদের এক সাম্প্রদায়িক আক্রমণকে প্রতিরোধ করে অভূতপূর্ব সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এই ঘটনায় প্রমাণ করে যে, একমাত্র ইস্পাতকঠিন সুদৃঢ় একতার মাধ্যমে চরম ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করা সম্ভব। এটা সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক আক্রমণকে একতাবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে জুম্ম জনগণকে ভবিষ্যতে প্রেরণা যোগাবে।

ঘটনার সূত্রপাত হয় এভাবে, ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে ইসহাক নামে এক সামাজিক সন্ত্রাসী হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। এলাকার মুসলমান বাঙালীরা এই ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার জন্য কোন প্রমাণ ছাড়া শান্তি বাহিনীকে দায়ী করে থাকে। কিন্তু শান্তি বাহিনীকে দায়ী করলেও মুসলমান বাঙালীরা সাধারণ জুম্ম জনগণকে আক্রমণ করে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা জুম্মদের বিরুদ্ধে মিটিং ও মিছিল করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনামূলক বক্তব্য ও শ্লোগান দেয়। প্রকাশ্যে জুম্মদের আক্রমণ করার কথা ঘোষণা করে। মারিশ্যা বাজার ও থানা সদরের বিভিন্ন অফিস আদালত জুম্মদের জন্য বন্ধ করে দেয়। এতে জুম্মজনগণের চরম নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। জুম্ম জনগণ জীবন রক্ষাকারী ঔষধপত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে চরম এক অবস্থার বিপাকে পড়ে। এরফলে চিকিৎসা ও ঔষধের অভাবে এক জুম্ম বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে। অনেক জুম্ম গ্রামবাসী সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে শুরু করে।

মুসলমান বাঙালীদের এরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির নাজুক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জুম্ম জনগণও আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। এই চরম সাম্প্রদায়িকতার মুখে সকল স্তরের জুম্ম জনগণ একতাবদ্ধভাবে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সকল প্রকার সামাজিক ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ভুলে জুম্মদের মধ্যে এক অভাবনীয় একতা গড়ে উঠে। পরিশেষে সরকার আয়োজিত এক মিটিং-এ জুম্মরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে "আমরাও সাম্প্রদায়িক আক্রমণকে রুখতে প্রস্তুত"।

জুম্ম জনগণের এই একতা ও দৃঢ়তার মুখে অবশেষে দাঙ্গাবাজ মুসলমান বাঙালীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতে পিছপা হয়। জুম্ম জনগণের চরম ঐক্যের মহিমা কালজয়ী হয়ে উঠে।

বাঘাইছড়িতে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর পাঁয়তারা মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র জুম্ম জনগণের বর্তমান চরম অসহায়তার এক বহিঃপ্রকাশ। যেহেতু বিগত দুই দশকের অধিক দিন ধরে জুম্ম জনগণ বার বার সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়েছে; মুসলমান বাঙালীদের এরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে এযাবৎ হাজার হাজার জুম্ম নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ নিহত হয়েছে, নিজ বাস্তুভিটা ও জমি হারিয়ে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার আজ নিজ দেশে প্রবাসী ও বিদেশে শরণার্থী জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৮৮ সালেও বাঘাইছড়ির জুম্ম জনগণ এরূপ এক গণহত্যার ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েছিল। এই গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ ও উদ্বাস্তু জুম্মদের সেই বার বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল; এই ঘটনায় বাঘাইছড়ির জুম্ম জনগণকে এই শিক্ষা দেয় যে, পালিয়ে আত্মরক্ষা করার মত কোন নিরাপদ জায়গা নেই জুম্মদের। তাই নিজস্ব বাস্তুভিটা, জমিজমা রক্ষা করতে গড়ে তুলতে হবে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। একমাত্র এরকম আন্দোলনই জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়। এই বাস্তবতার আলোকে বাঘাইছড়ির জুম্ম জনগণ এবারে এই অজেয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করতে সমর্থ হন।

আজ এটা অত্যন্ত বাস্তব যে, জুম্ম জনগণ বর্তমানে শুধু রাজনৈতিক শিকার নয়, তারা মুসলমান বাঙালীদের চরম ধর্মান্ধতা ও উগ্রবাঙালী জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িকতার শিকার হচ্ছে। যেহেতু বিগত দেড় দশকে জুম্ম জনগণের উপর যতগুলো গণহত্যা ও দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, সবগুলো ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চেয়ে বেধর্ম ও সাম্প্রদায়িক উস্কানী ছিল বেশী। তাই প্রতিটি দাঙ্গার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কোন একজন মুসলমান বাঙালীর মৃত্যুর প্রতিহিংসায় দাঙ্গাবাজ মুসলমান বাঙালীরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে নিরীহ জুম্ম নরনারীকে হত্যা ও আক্রমণ করেছে। যেমন ১৯৮৮ সালের ৮ই আগষ্ট বাঘাইছড়ি থানার খাগড়াছড়ি সেন্ট্রিপোষ্টের কাছে শান্তি বাহিনীর আক্রমণে কয়েকজন আর্মিসহ বটতলীর একজন স্পীড বোট চালক নিহত হয়। এই নিহত বাঙালীর প্রতিশোধে বটতলীর মুসলমান বাঙালীরা বাঘাইছড়ি (মারিশ্যা) থানা সদরের অফিস আদালত, স্কুল কলেজে হামলা চালিয়ে তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান লক্ষী কুমার চাকমাসহ জুম্ম সরকারী কর্মচারী ও কাচালং কলেজের জুম্ম ছাত্র-শিক্ষককে আক্রমণ করে। অথচ শান্তিবাহিনীর এই হামলার সাথে বটতলীর মুসলমান বাঙালীদের কোন সম্পর্ক ছিলনা। এটা ছিল সরকারী সেনাদের উপর শান্তিবাহিনীর এক সামরিক আক্রমণ। আর ঘটনাটিও ঘটেছিল থানা সদর থেকে ৮-১০ মাইল দূরে। তদুপরি সেই দাঙ্গায় আক্রান্ত জুম্মদের সাথে সেই শান্তিবাহিনীর হামলারও কোন যোগসূত্র ছিল না। তাই নিছক বেধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার নিরিখে এই দাঙ্গা সংঘটিত করা হয়। অনুরূপভাবে লংগতুর তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যানের হত্যাকে কেন্দ্র করে ভিডিপিসহ মুসলমান বাঙালীরা ১৯৮৯ সালে ৪ঠা মে লংগদু গণহত্যা ও ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল এক রাখাল বালকের হত্যার প্রতিহিংসায় লোগাং গণহত্যা সংঘটিত করে। এছাড়া অন্যান্য গণহত্যা যেমন—কলমপতি গণহত্যা (১৯৮০), ভূষণছড়া গণহত্যা (১৯৮৪), চংড়াছড়ি গণহত্যা (১৯৮৬), পানছড়ি গণহত্যা (১৯৮৬), রামবাবু ঢেবা গণহত্যা (১৯৮৬), নানিয়ারচর গণহত্যা (১৯৯৩), প্রভৃতি ঘটনাতেও প্রতিহিংসার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসাও সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক কালে কজোইছড়ি সেনা ক্যাম্পের পোষ্ট কমাণ্ডার লেঃ ফেরদৌস ও কতিপয় ভিডিপি কর্তৃক কল্পনা চাকমা পীং গুণ রঞ্জন চাকমা সাং নিউলাল্যাঘোনা, থানা-বাঘাইছড়ি অপহৃতা হওয়ার প্রেক্ষিতে জুম্ম ছাত্র জনতা এর প্রতিকারের দাবী জানাতে গিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর মদতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় চারজন জুম্ম ছাত্র যুবককে অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলমানেরা হত্যা করে ও সেখানে অদ্যাবধি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করার অপচেষ্টা চলছে; এছাড়া কোন এক কায়েমী ও স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার অনুপ্রবেশকারী ক্যাম্পের কিছু সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীর তথাকথিত নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি কেন্দ্র করে নানাভাবে স্থানীয় জুম্ম জনগণের উপর অহেতুক ভীতি সঞ্চার করছে। উক্ত অনুপ্রবেশকারীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার পশ্চাতে যে শান্তিবাহিনীর হাত রয়েছে এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অজুহাতে কায়েমী মহল পানছড়িতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাঁধানোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণহত্যায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু এসব গণহত্যার শিকার হয়েছিল নিরীহ জুম্ম নর-নারী ও শিশু-বৃদ্ধ। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে কোন শান্তিবাহিনী বা আন্দোলনকারীকে নয়, নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সম্প্রদায়ভুক্ত জুম্ম বলে তাদেরকে হত্যা করা হয়। তাই এসব ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চেয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসাই বেশী প্রবল ছিল। তাছাড়া চলতি দশকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে গঠিত পার্বত্য গণ পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় শান্তি ও সমন্বয় পরিষদ বারবার সাম্প্রদায়িক আক্রমণ চালিয়েছে জুম্ম জনগণের উপর। এই পার্বত্য গণ পরিষদ এবং শান্তি ও সমন্বয় পরিষদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ১৩ই অক্টোবর' '৯৩ দিঘীনালায় ২০শে মে' ৯৩ রাঙ্গামাটিতে এবং ১৫ই মার্চ' ৯৩ বান্দরবানে জুম্ম ছাত্র জনতার সাংগঠনিক

সভায় হামলা চালিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জিঘাংসা চরিতার্থ করেছিল। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের তাড়ানোর অজুহাতে সকল জুম্মদের বাড়ীঘর পুড়ে দেয়া হয়েছিল। এতে প্রতিটি ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ লাভ করে।

আজ এটা সকলের কাছে স্পষ্ট যে, জুম্মদের উপর সংঘটিত এসব গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিরোধ নয় সমগ্র জুম্মদের উচ্ছেদ করে তাদের বাস্তুভিটা ও জমিজমা দখল করা। আর এই লক্ষ্যে বেআইনী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানেরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল গড়ে তুলেছে। এসব সাম্প্রদায়িক দলগুলো আজ সামান্য অজুহাতে জুম্মদের উপর আক্রমনোন্মুখ হয়ে আছে। তাদের হিংস্র থাবা যেকোন সময় শহরবাসী ও হাট-বাজারের পার্শ্বস্থিত জুম্মদের উপর নেমে আসতে পারে। তাই বলতে গেলে আন্দোলন বিমুখ এই শহরবাসী নির্বোধ ও শান্তিকামী জুম্মদের জীবনের নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। জুম্মদের এরূপ নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় জানুয়ারী '৯৪ইং এক রিক্সাওয়ালার রহস্যময় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। যখন মুসলমান বাঙালীরা খাগড়াছড়ি জেলা সদরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর পাঁয়তারা করে, ২৯শে অক্টোবর '৯৪ইং এক বিধবা মৃগী রোগীর অজ্ঞাত মৃত্যুর জন্য মার্মাদের দায়ী করে, চংড়াছড়ি হেডম্যান পাড়ায় অনুপ্রবেশকারীদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণে এবং সাম্প্রতিককালের বাঘাইছড়ি (মারিশ্যা) পানছড়ি ঘটনার প্রবাহে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাঘাইছড়ির সমগ্র জুম্ম জনগণ এবারে দাঙ্গার প্রতিরোধে তাদের একতাবদ্ধতা ও দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদের অবশ্যই চরম নৃশংসতার শিকার হতে হতো। তাই বাঘাইছড়ি জুম্ম জনগণের এই সংঘবদ্ধতা সমগ্র জুম্ম জনগণকে একতাবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের প্রেরণা যোগাবে তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংগ্রামী মানসিকতা দৃঢ়তর করে তুলবে তা বলাই বাহুল্য। যে জাতি সংগ্রাম করে বাঁচতে জানে সেই জাতির ধ্বংস নেই—এই সত্যটি আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

জীবনের জন্য জমি, অস্তিত্বের জন্য আন্দোলন এবং নব নির্বাচিত সরকার ও আজকের প্রত্যাশা

শ্রীসুপ্রিয়

ঢাকার শাহবাগ মোড় থেকে কয়েক হাজার গজ উত্তরে বাংলা মোটর। এই বাংলা মোটরের সন্নিকটে 'বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে' বসে কথা হচ্ছিল। যার সাথে কথা হচ্ছিল তার নাম আব্দুল্লাহ আবু সাইদ। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের তখনকার পরিচালক, বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মোটামুটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশ টেলিভিশনেও এক সময় একটা প্রোগ্রামের উপস্থাপকের কাজ করেছিলেন। একটা বেশ চমৎকার ঘটনার কথা বললেন তিনি। কোন এক সময় অনেকটা বিনোদন ও কিছুটা পেশাগত কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে এসেছিলেন। বান্দারবান শহর, সাঙ্গুনদী, রাজবাড়ী ইত্যাদি ঘুরে তিনি গিয়েছিলেন চিম্বুক পাহাড় দেখতে। সবুজ বনাঞ্চলে ঢাকা সারিসারি উচুঁ উচুঁ পাহাড়, পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভাসমান মেঘের লুকোচুরি খেলা, সাঙ্গুনদীর আঁকা বাঁকা স্রোতধারা ইত্যাদি নয়নাভিরাম দৃশ্যে ভরপুর এই এলাকায় সেবারই তার প্রথম আগমন। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে কেবল মনোমুগ্ধকর সাজানো প্রকৃতি দেখতে দেখতে অবশেষে চিম্বুক পাহাড়ে পদার্পণ। বান্দরবান শহরের অদূরে চিম্বুক পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন শান্ত প্রকৃতির সবুজাভ সৌন্দর্য্যের দিকে। দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া শত সহস্র উচুঁ পাহাড়, খরস্রোতাস্বীনী, বন বনানীর মহা সমারোহ আর নৈসর্গিক পরিবেশ দেখে তিনি আবেগে আনন্দে আপ্লুত হয়েছিলেন। অপরূপ এই পরিবেশে অকৃত্রিম প্রকৃতির অকৃপণ উদারতার হাতছানি কল্পনা বিলাসী এই সাহিত্যিকের হৃদয়ে এক উদগ্র আকাংখার জন্ম দেয়। শান্ত নির্মল প্রকৃতির লীলা ক্ষেত্রে তিনি অপার শান্তির পায়রা খুঁজে পান এবং এই মনোরম পরিবেশে তার কবর রচিত হোক তাই প্রার্থনা করেন। মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ চিম্বুক পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর শায়িত হবে এবং তিনি চির নিদ্রায় অনন্তকাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝে বিলিয়ে থাকবেন এটাই তার একান্ত ইচ্ছা। রাজধানীর অস্বস্তিকর পরিবেশে ক্লান্ত ভদ্রলোক শান্ত সুস্থির পাহাড়ের চূড়ায় সমাহিত হয়ে জীবনের সুখ খুঁজে পেতে চান। আজিমপুর গোরস্থানের ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে এই পাহাড়ের নীরবতা স্বর্গের সান্নিধ্য দেবে এই তার বিশ্বাস। সুতরাং তার এক টুকরো জমির মালিকানা প্রয়োজন। তাই চিম্বুক থেকে ফিরে সরাসরি বান্দরবান জেলা প্রশাসকের অফিসে গিয়ে তিনি চিম্বুক পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর কবরের সম পরিমাণ এক চিলতে জমি বন্দোবস্তি পাওয়ার আবেদন জানান। জেলা প্রশাসক ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তদানকারী প্রধান হলেও এখানকার বেসামরিক প্রশাসন যে সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন তা বুঝিয়ে দিয়ে তার অপারগতা প্রকাশ করেন এবং স্থানীয় ব্রিগেড কমাণ্ডারের কাছে যেতে অনুরোধ করেন। অগত্যা তিনি সেনা ছাউনিতে গিয়ে ব্রিগেড কমাণ্ডারের শরণাপন্ন হলেন। ব্রিগেড কমাণ্ডারের সাথে প্রথম আলাপচারিতায় জানা গেল কোন এক সময় আবদুল্লাহ আবু সাইদ ব্রিগেড কমাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘ বছর পর দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের আবদুল্লাহ আবু সাইদ তার এক সময়কাল ছাত্রকে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে বেশ খুশী হয়েছিলেন। ব্রিগেড কমাণ্ডার সানন্দে তাকে গ্রহণ করলেন। সেনা কর্মকর্তা আপ্যায়ন পর্বের শেষে আবদুল্লাহ আবু সাইদ সাহেবের বান্দরবান আগমনের কারণ জানতে চান। আবদুল্লাহ সাহেব তার একান্ত ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে বলেন যে, তিনি

চিম্বুকের মাথায় তার কবরের জন্য এক খণ্ড জমির মালিকানা পেতে চান। ব্রিগেড কমাণ্ডার সগর্বে বলে উঠেছিলেন "কত একর চায় স্যার" জবাবে তিনি বলেন, মাত্র একটি কবরের সম পরিমাণ জমি তার দরকার। সেনা কর্মকর্তা ঈষৎ হেসে ফেললেন! মনে হলো ব্যাপারটি তার কাছে হাস্যকর ও নেহায়েত মামুলি ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিলেন। তাই সামরিক দাপটের ছোঁয়াই আবদুল্লাহ্ আবু সাইদ সাহেব মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক খণ্ড জমির মালিকানা লাভ করলেন!

তারপর অনেকদিন হারিয়ে গেছে কালগর্ভে। গড়িয়ে গেছে চেঙ্গী, মাইনী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী আর কর্ণফুলীর অনেক জল। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে গেছে '৯২ এর লোগাং গণহত্যার মত আরো অনেক বীভৎস হত্যাকাণ্ড। নানিয়ার চরের মত অনেক নির্মম হত্যাকাণ্ডের রক্তে ভিজে গেছে এখানকার মাটি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে এখানকার সরলপ্রাণ মানুষ। রচিত হয়েছে অসংখ্য গণ কবর পাহাড়ের অলিতে গলিতে। বিগত এই দুঃসময়ে নিশ্চয়ই পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসেননি আবদুল্লাহ আবু সাইদ। অথচ মৃত না হয়ে জীবিত অবস্থায় আসতে পারতেন। যতদূর জানা যায় তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তাই চিম্বুক পাহাড়ে তার কবর রচিত হয়নি আজও। চিত্ত বিনোদনে এখানকার প্রকৃতি তাকে হাতছানি দিলেও এলাকার মানুষদের দুর্দিনে সমবেদনা জানাতে আসতে তার মন ততটুকু নিশ্চয়ই আগ্রহী ছিলনা। অবশ্য এটাই তো স্বাভাবিক। এখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আদিবাসী মানুষ, তাদের সমাজ সংস্কৃতি দেখার আগ্রহে, শিক্ষা গবেষণা ও পেশাগত দায়দায়িত্বে, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে, সর্বোপরি বিস্তৃত জমির লোভে ইত্যাদি অনেক কারণে অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন। যেহেতু পশ্চাৎপদ মানুষদের পশ্চাৎপদ সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, প্রকৃতির রূপরস ইত্যাদি বাংলাদেশের অনেক লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ছাত্র শিক্ষক থেকে শুরু করে নানা পেশার নানা নেশার মানুষের মনে আগ্রহ ও আনন্দের খোরাক যোগায়। এখানকার মাটি ও প্রাকৃতিক সম্পদে আকৃষ্ট হন অনেকে ব্যবসা বিনোদন, পেশা নেশা, লোভ-লালসা নানা কারণে আগমন করেন অসংখ্য সমতলবাসী। জমির মালিকানা নেন বৈধ অবৈধ পন্থায়। এ অঞ্চলের মানুষদের জীবন নয় এখানকার জমিই আসলে টানে বেশী। অর্থাৎ মানুষ নয় মাটিই প্রধান। ব্যবসায়ী, সামরিক বেসামরিক আমলা, রাজনীতিক সবাই মাটির মালিকানা চান। আ. স. ম. আবদুর রব, মওদুদ আহমেদ, কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমেদ সহ অনেকেই হাজার হাজার একর জমির মালিক হয়েছেন বলে জানা যায়। এক সময়ের ধুরন্দর জেলা প্রশাসক আলী হায়দার খান, খোরশেদ আনসার খান সবাই ইচ্ছামত বিশাল জমির মালিকানা নিয়েছেন। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী আত্মীয় স্বজন সবাইকে দেদার বন্দোবস্তি দিয়েছেন প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা।

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বছর চারেক আগে ঢাকার মহাখালী এলাকার (অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের) এক অভিজাত পল্লীতে যাওয়া হয়েছিল। রেল লাইনের ধারে অবস্থিত এই এলাকাটিতে বাস করেন সব ক্যাপ্টেন, মেজর, ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারেল ইত্যাদি ছোট বড় অনেক সামরিক অফিসার। ডি. এইচ. কিউ সম্ভবতঃ পল্লীর নাম। দেশী বিদেশী নানা ডিজাইনের সুরম্য পাকা দালানে ঠাসাঠাসি এই আবাসিক এলাকাটি বেশ সুন্দর, পরিছন্ন ও শান্ত। যার কাছে যাওয়া হয়েছিল তিনি ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কের। দীর্ঘদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত। বিগত সরকারের আমলে প্রতিমন্ত্রী থেকে পরবর্তীতে পূর্ণমন্ত্রীও হয়েছিলেন। সেগুন কাঠের কারুকার্য খচিত দরোজা পেরিয়ে যখন ওয়েটিং রুমে নিয়ে বসানো হল তখন রুমটা অনেক দর্শনার্থীতে ভর্তি চারটি টেলিফোন সেটের সামনে বসে তিনি বিরতিহীনভাবে একটার পর একটা রিসিভার তুলে কথা বলছিলেন। দীর্ঘক্ষণ বিরক্তিকর অপেক্ষার পর অবশেষে সৌজন্য কথাবার্তার পর আলোচনার গভীরে

যাওয়া। অর্থহীন কথা বলে চললেন। অনেক অতীতের ঘটনার কথা বলে প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে তিনি সব অবগত। তাকে নূতন করে জ্ঞানদান করার প্রয়োজন নেই। তবুও বলা হল সরকারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কারণে যে অহরহ প্রাণহানি চলছে সেদিকে খেয়াল রাখতে। কিন্তু তিনি এক অদ্ভূত কথা শোনালেন। "বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিদিন যানবাহান দুর্ঘটনায় যত লোক মারা যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কারণে সেখানে এক বছরেও ততলোক মরে না। So, we don't care of it. আমরা বড় বড় জাতীয় সমস্যাগুলো নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই ঐ আঞ্চলিক আইন শৃংখলাজনিত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।" কি নির্মম, নিষ্ঠুর বক্তব্য! সত্যি তো পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের নয় মাটিই তাদের চায়। উক্ত ব্রিগেডিয়ারের মন্তব্যটি এক সময় 'দিক চিহ্ন' সাপ্তাহিকে লিখেছিলেন পাপড়ি (বর্তমানে দৈনিক বাংলায় কর্মরত)। উক্ত সাপ্তাহিকে তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়। স্বৈরাচারী এরশাদের পরবর্তী নির্বাচিত বি এন পি সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে এত মাতামাতি সহ্য হয়নি সেনা কর্তাদের। তাই 'দিক চিহ্ন' পত্রিকার সম্পাদক মোহন রায়হানকে ISPR (ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন)-এর লোকেরা চোখ বেঁধে এক রাত্রি রেখে দিয়েছিল ঢাকার সেনানিবাসে।

আসল কথায় ফিরে আসা যাক। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের যে সংগ্রাম চলছে তা আদতে জুম্ম জনগণের জমির জন্য লড়াই। ভূমির জন্য ভূমি পুত্রদের রক্তাক্ত সংগ্রাম। অর্থাৎ জীবনের জন্য জমির দাবী। অধিকারের জন্য আন্দোলন। অস্তিত্বের জন্য এই আন্দোলন। রক্ত পিচ্ছিল সংগ্রাম রাজনৈতিক অধিকারের জন্যই। যেহেতু এই অধিকার ব্যতিরেকে জমি কিংবা জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা হতে পারেনা। অথচ দেখতে দেখতে দুই যুগ হয়ে গেল। পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলবাসী বাঙালী মুসলিম জনগণের অনুপ্রবেশ ঘটতে চলছেই। অবৈধ অনুপ্রবেশ আর জমি জবর দখল বাড়ছেই। দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে জনসংখ্যা। সর্বশেষে ভোটার তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় কি উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে বাঙালী মুসলিম জনসংখ্যা।

জেলা	মোট ভোটার	জুম্ম	অজুম্ম
খাগড়াছড়ি	২,১৬,৮০৪	৫৫%	৪৫%
রাঙ্গামাটি	২,৩৪,৯৬২	৫২%	৪৮%
বান্দরবান	১,৩৩,০১৩	৪০%	৬০%

গত বছরের জানুয়ারী মাসে রাঙ্গামাটিতে ICIMOD (International Centre for Inergrated Mountain Development) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে এক Workshop এ এক লিখিত বক্তব্যে ডঃ মহম্মদ হারুনর রশিদ বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৮১-৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৬৩% অথচ একই সময়ে গোটা বাংলাদেশে এই হার মাত্র ২.১৭%।" এই পরিসংখ্যান থেকে আমাদের কারোর বুঝতে অসুবিধা নেই যে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে কিভাবে ভূমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বই যে মহা সংকটের মুখোমুখি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের জুম্ম শিক্ষিত সচেতন মহল বিশেষতঃ শিক্ষিত ও অধিকারকামী জুম্ম যুব সমাজ কতটুকু সচেতন তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকে যায়। দোদুল্যমান, আন্দোলনের প্রতি সন্দিহান এবং স্বার্থান্বেষী সামন্ত মানসিকতা সম্পন্ন অংশ তো প্রতিক্রিয়া করেই ক্ষান্ত নয়। নিজের পায়ের তলার মাটি যে সরে যাচ্ছে সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই। বরং দালালী আর আপোষ করতে করতে বিকিয়ে দিচ্ছে সবকিছু। মধ্যপন্থী সুবিধাভোগীরাও নির্ঝঞ্ঝাট ঠাঁই খুঁজে পেতে ব্যস্ত। কাজেই বেশীর ভাগ দায় দায়িত্ব এসে যায় শিক্ষিত ছাত্র যুব সমাজের উপর। বিগত ৮০ দশক থেকে তারাও আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট উদাসীনতা, আত্মমুখীনতা, স্বার্থপরতা ও উচ্চাভিলাষ দেখাচ্ছে। অথচ এমন দেখানোর কোন অবকাশ নেই। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে বিশেষতঃ শিক্ষিত যুব সমাজের প্রত্যেকের এই

বাস্তবতাকে অনুধাবন করা উচিত যে—রাজ পথের আন্দোলন করে, মিছিল ধর্মঘট করে, সভা-সমিতি করে, সংসদীয় মঞ্চে আন্দোলন করে কোন একটা মানুষ অথবা কোন একটা জাতি মানুষের মত বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার যেমন শ্রমের অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জন করতে পারে না। শাসক-শোষক গোষ্ঠীর থেকে এমনিতেই অধিকার পাওয়া যায় না। তাদের থেকে অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়। এটাই মানব জাতির ইতিহাস। সুতরাং এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে জুম্ম যুব সমাজ বিশেষতঃ শিক্ষিত সচেতন ও অধিকার-কামী জুম্ম যুব সমাজকে এই মুহূর্তে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসে শাসক-শোষক গোষ্ঠী থেকে অধিকার ছিনিয়ে আনার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে সামিল হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় জুম্ম জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তি অবধারিত। এক্ষণিই কিছু একটা করার উদ্যোগী না হলে পরিস্থিতি আওতার বাইরে চলে যেতে পারে। যে হারে জমি হারিয়ে জুম্ম জনগণ উচ্ছেদ হচ্ছে, যে হারে জুম্ম জনগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে সে হারে চলতে থাকলে গোটা পরিস্থিতিটা নাগালের বাইরে যেতে বেশীদিন লাগবে না এটা নিশ্চিত। তাই মোহভঙ্গ হওয়া আবশ্যক জুম্ম ছাত্র যুব সমাজের।

স্বাধীনতার পর এদেশে বহুবার সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। সরকার বদল হয়েছে বৈধ অবৈধ পথে। রাজনীতির পালা বদল ও সরকারের পরিবর্তন কোনটাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেনি। সকল ক্ষেত্রে সব সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত রয়েছে। জুম্ম জনগণের উপর উৎপীড়ন ও উচ্ছেদনীতি বরাবরই বহাল রয়েছে। সামরিক স্থাপনার সম্প্রসারণ ও বেআইনী বেসামরিক বাঙালী মুসলিম উদ্বাস্তু পরিবারের স্থানান্তর বেড়েছে বৈ কমেনি। পূর্ব্বর্তী সকল সরকারের সকল কার্যক্রম ও নীতি পূর্ববর্তী সকল সরকার সমূহ অবলীলায় অব্যাহত রেখেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে। দীর্ঘ নয় বছর পর স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন হলে বাংলাদেশে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রচলন। সারা দেশের নিপীড়িত মানুষের মত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও একটা পরিবর্তনের প্রত্যাশা করছিল। এরশাদ সরকারের গৃহীত অনেক কর্মসূচী এবং বিধি ব্যবস্থা বাতিল করে তৎকালীন তত্ত্বাধায়ক সরকারের প্রধান সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ। স্বভাবতই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান ও এরশাদ সরকারের চাপিয়ে দেয়া পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ বাতিলের দাবীতে তীব্র আন্দোলন হচ্ছিল তখন। যেহেতু বাংলাদেশের অন্য সকল জেলা পরিষদগুলো বাতিল করা হয়েছিল। ৩০শে জানুয়ারী '৯১ পাহাড়ী গণপরিষদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে এক প্রতিবাদ সমাবেশ, র‍্যালি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ বাতিলের দাবীতে স্মারকলিপি দেয়া হয়। সেদিনই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান রাঙ্গামাটি সফরে আসেন এবং স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। তিনি বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ববর্তী সরকারের সকল কার্য্যক্রম ও নীতিমালা অব্যাহত থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এহেন মনোভাবে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তারপরই গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা স্মরণ রেখে কিছু একটা হবে এই প্রত্যাশায় দিন গুণতে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্ট সমস্যার একটা ন্যায় সঙ্গত সমাধান হবে অনেকটা এই আশা নিয়ে তিন জেলায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিপুলভাবে সমর্থন দিয়ে নির্বাচিত করে। অবশেষে বি এন পি'র নেতৃত্বে নির্বাচিত সাংসদরা সরকার গঠন করে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক সরকার আসে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া পার্বত্য জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিলের জন্য আবার আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিও শান্তি স্থাপনের পরিবেশ ও আলোচনার স্বার্থে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেয়। দাবী পূরণ ও শান্তি ফিরবে এই প্রত্যাশা বাড়তে

থাকে জনগণের মনে। কিন্তু না বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ৯২ সালের ১০ই এপ্রিল লোগাং এ চালানো হয় এক ভয়াবহ পৈশাচিক গণহত্যা! প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজে এবং বিরোধী দল নেত্রী শেখ হাসিনা উভয়েই ঘটনাস্থল দেখতে আসেন। সমবেদনা, আশ্বাসবাণী শুনিয়ে যান। এদিকে লোগাং গণহত্যার রক্তের দাগ শুকোতে না শুকোতেই চল্লিশ দিনের মাথায় রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সম্মেলনে সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে হামলা করে বসে হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী। এভাবেই চলতে থাকে নির্বাচিত সরকারের শাসনকাল। অতঃপর ৯৩ সাল শেষ হতে না হতেই ১৭ই নভেম্বর নানিয়ার চরে আরো পরিকল্পিত গণহত্যা চালানো হয়। তা ছাড়া গুপ্ত হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, গ্রেপ্তার, ভূমি বেদখল তো চলতেই থাকে অহরহ। কাজেই নির্বাচিত সরকারের প্রতি জুম্ম জনগণের আস্থা বিশ্বাস থাকার কোন অবকাশ থাকে না। নির্বাচিত বি এন পি সরকারও স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ করায় পাশাপাশি জুম্ম জনগণের উপর দমন পীড়নের মাত্রা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। এমনি করে নির্বাচিত সরকার মেয়াদ শেষ করে দেয়। অপরদিকে সংলাপ প্রক্রিয়া চললেও তা কখনো ইতিবাচক পরিণতির দিকে যায়নি। সংলাপের মাধ্যমে সময় ক্ষেপনের কৌশলতাই সুস্পষ্ট হয়েছে। কোন রকমে পরিস্থিতিকে শান্ত রাখার স্বার্থে নয়ছয় করে সংলাপ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করাই ছিল বিগত বি এন পি সরকারের মুখ্য বিষয়। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি ছিল। খালেদা জিয়া নির্বাচনী সফরে চট্টগ্রামে এসে এবিষয়ে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি কেউ রাখেনি। ৯১-এর নির্বাচনী ইশতেহারে বি এন পি ৮নং শর্তে বলেছিল "অনগ্রসর উত্তর অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ"। অর্থাৎ বুলিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের কথা বললেও বি এন পি সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে সেই কথা এড়িয়ে গেছে।

এবারের অর্থাৎ ১৯৯৬ইং নির্বাচনে আওয়ামীলীগ তার ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে যা বলেছে তা হল—"পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ও ধর্মীয় আচার বিধি পালনের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়া হবে"। এই কথা সত্য যে, সত্তর দশকের আওয়ামীলীগ আর আজকের আওয়ামীলীগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অতীতের অনেক ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে এসেছে আওয়ামীলীগ! স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের প্রতি আওয়ামীলীগ তার পূর্বের ধারণা পরিবর্তন করার কথা! আগেকার যে কোন সরকারের তুলনায় বর্তমান নির্বাচিত ক্ষমতাসীন সরকার অধিকতর উদার ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসবে এটাই আশা করা যেতে পারে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও আওয়ামীলীগের প্রতি আগ্রহের সাথে তাকিয়ে আছে। গত দু-দু'বার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামীলীগ প্রার্থীকে জিতিয়ে দেয়ার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই বর্তমান সরকারের আমলে কিছু একটা অগ্রগতি হবে এটাই জুম্ম জনগণের প্রত্যাশা। পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি নয় মানুষের কল্যাণে বর্তমান সরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসবে এটাই সকলের কাম্য।

সংবাদ

সেনাবাহিনীর যুদ্ধ বিরতি লংঘন ও শান্তি বাহিনীর উপর আক্রমণ

বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার বিরাজমান যুদ্ধবিরতি লংঘন করে বাংলাদেশ সেনারা পার্বত্য চট্টগ্রামের দিঘীনালা, পানছড়ি, মাটিরাংগা, বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, থানছি ও রোয়াংছড়ি থানায় তল্লাসী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এইসব অভিযানে সেনারা প্রকাশ্যে শান্তিবাহিনীর গোপন আস্তানা খোজ করছে ও নিরীহ জুম্মদের হয়রাণী করছে। বিগত ২৬শে আগস্ট, ৯৬ তারিখে বাবুছড়া জোনের অধীন ছিনালাছড়া ক্যাম্পের বাংলাদেশ সেনারা এরূপ এক অভিযানে দিঘীনালা থানাধীন বাবুছড়া এলাকার ভুইয়া আদাম গ্রামের (জারুলছড়ির কাছে) নিকট একদল শান্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে একজন শান্তিবাহিনী সদস্যকে আহত করে। সেনারা শান্তিবাহিনী সদস্যদের কিছু কাপড় চোপড় সহ তিনটি চটের ব্যাগ দখল করে এবং ঐ গ্রামে তিন জুম্ম বালিকা ও এক জুম্ম মহিলাকে আটক করে। এরপর কয়েকজন সেনা জওয়ান তিন বালিকাকে ধর্ষণের অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে গ্রামের কার্বারীর হাতে হস্তান্তর করে এবং পরদিন ক্যাম্পে হাজির করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে চলে যায়। পরদিন উক্ত তিন বালিকাকে ক্যাম্পে হাজির করা হলে শান্তিবাহিনী সদস্যদের ফেলে যাওয়া তিনটি চটের থলে দিয়ে তাদের ফটো তোলা হয় এবং সেদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদেরকে ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ খাদ্যশস্য ও অর্থ আত্মসাৎ এবং অনিয়মের আখড়া

বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদও দুর্নীতি আর অর্থ তছরুপের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

অতি অপ্রতি রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের অনিয়ম ও দুর্নীতির আরো একটি গোমর ফাঁস হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের নামে বরাদ্দ কৃত হাজার হাজার মেট্রিকটন খাদ্যশস্য ও লক্ষ লক্ষ টাকা লুটেপুটে নিচ্ছে স্বপ্নাবিলাসী জেলা পরিষদের জনদরদী নেতারা। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের অনুমোদনক্রমে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের স্মারক নং প্রাপুঅ/কাবিখা-২/বিখাক/কল্যাণ/১২৬/৯৫/৩৪৮, তারিখ ২২/০৫/৯৬ইং মূলে রাঙ্গামাটির ৩টি থানার ৪৩২১টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ২৩৫৯.২৭ মেঃ টন খাদ্যশস্য এবং গৃহ নির্মাণ ও কৃষি অনুদান বাবত এককালীন ৪৫,৩৭,০৫০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিছু পরিবারকে লোক দেখানো সামান্য টাকা প্রদান করার পর জেলা পরিষদ সদস্যবৃন্দ ও কর্মচারীরা সিংহভাগ অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগী করে নিয়েছে।

উক্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী এখন সোচ্চার। "রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সরকার পরিষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংগ্রাম কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করে উক্ত অনিয়ম অর্থ আত্মসাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

বেআইনী অনুপ্রবেশ ও সরকারীভাবে ভূমি হস্তান্তর জোরদার

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য জেলা থেকে বাঙালী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ, বসতি সম্প্রসারণ ও ভূমি বেদখল অব্যাহতভাবে চলে আসছে। অতি সম্প্রতি এই অনুপ্রবেশ, নূতন স্থানে বসতি সম্প্রসারণ, জালিয়াতি করে ভূমি হস্তান্তর এবং সরকারীভাবে বন্দোবস্তী প্রদান প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন রাতে চলাচলকারী বাসে করে এক বা একাধিক মুসলমান বাঙালী পরিবার সামান্য তল্পিতল্পা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করছে এবং বিভিন্ন জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে এই পরিবারগুলোকে বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে পাঠিয়ে পুনর্বাসন দেয়া হচ্ছে। বিগত

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ৫টি ট্রাকে করে প্রায় ১৫০ অনুপ্রবেশকারী পরিবারকে রাতের অন্ধকারে খাগড়াছড়ি শহর থেকে দিঘীনালা থানাধীন কবানালী ও মেরুং এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে গত জুন থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে ৮০টি অনুপ্রবেশকারী পরিবারকে পানছড়ি থানাধীন লোগাং গুচ্ছ গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এদেরকে নিয়ে লোগাং গুচ্ছগ্রামে এভাবে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা দাড়াল ২০৯। আরো উল্লেখ যে, এইসব নূতন অনুপ্রবেশকারীও বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন প্রদান, জমিজমা হস্তান্তর ও বন্দোবস্তী প্রদান প্রক্রিয়া দেখাশুনার জন্য খাগড়া পার্বত্য জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ কামালউদ্দিন সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক অফিসের (খাগড়াছড়ি) বরাতে ২২শে জুলাই '৯৬ ইং তারিখে চারজন জেলা পরিষদের তল্পিবাহক সদস্য— ১) মনটু বিকাশ চাকমা (পানছড়ি) ২) রুইথি কার্ঠারী (মহালছড়ি) ৩) নুর মহম্মদ (দিঘীনালা) ও ৪) বিবেকানন্দ চাকমা (দিঘীনালা)কে নির্দেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল থানাধীন ভূষণছড়া, ছোট হরিণা এলাকায়, লংগদু থানাধীন মানিকছড়ি, সোনাই এলাকায় জমি হস্তান্তর ও বন্দোবস্তী প্রধান জোরদারভাবে চলছে।

এই অনুপ্রবেশের গোপন পরিকল্পনায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অনুপ্রবেশকারী পরিবারগুলোকে গ্রহণ ও বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে পাঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে—

১) এ. বি. এম নাসিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (ইনচার্জ) স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, খাগড়াছড়ি, ২) মোঃ রফিক এন, ডি, সি, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, ৩) মোঃ ইয়াসমিন, ওয়ার্ড কমিশনার খাগড়াছড়ি পৌরসভা, ৪) আবুল কাসেম, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পৌরসভা।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

শুভেচ্ছা মূল্য— ৫টাকা